রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতির পরিচয়।

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ
দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, নতুন দিল্লি।

ABSTRACT:-

মানব জীবন ও মানব চরিত্রের আবেগ, অনুভূতি সংশয় বিদ্বেষকে সঠিক সাহিত্য-রসের আধারে জারিত করে তার প্রাণময় সম্বন্ধ রচনাই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জীবন সম্বন্ধে সংশয়াতীত ধারণা ও অভিজ্ঞতা। তাই বাংলা উপন্যাসেও সমাজ চেতনা ও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের ছায়া পড়েছে। কোন বিশেষ স্থান, সম্প্রদায়, স্থানিক ঘটনা নয় জীবন চেতনার ঊর্ধ্বে এক সচেতন কঠিন নিয়মশৃঙ্খল ও অন্তরঙ্গতা সমস্ত উপন্যাস গুলির মধ্যে একটি নিগূঢ় সত্যের জন্ম দেয়।

রাষ্ট্রনীতি মানুষকে সামাজিক প্রাণী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সংঘবদ্ধভাবে বাস করার প্রবৃত্তি তার আদি ও অকৃত্রিম। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। সমাজের মঙ্গলের জন্যই সমাজের শুভাশুভের কষ্টিপাথরে মানুষ সকল সাহিত্য-শিল্প দর্শনের মূল্য বিচার করেছে। এই সমাজ চেতনার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' শুধু ভারতবর্ষের উৎপীড়িত সমাজ-জীবনের কেন্দ্রবিন্দুটিকেই প্রতিভাত করেনি, তা এক বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও স্বাধীনতা পিপাসু ভারতীয়দের বলিষ্ঠ জীবনের দিকে পাঠককে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত উপন্যাসের আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করে ঊনবিংশ শতকের কোলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালী জীবনে যে নবজাগরণ ঘটেছিল এবং নতুন শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ ও জটিল মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল, উপন্যাসের বিষয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন সেই নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত মানুষের সামাজিক জীবনসমস্যাকে যা রাজনীতি ও জীবন- চেতনার প্রতিফলন। 'গোরা', 'চার অধ্যায়', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' উপন্যাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী চলমান হয়েছে সমসাময়িক বর্তমানের প্রেক্ষিতে।পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত, বামপন্থীয় দর্শন বাংলা উপন্যাসে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গোকুল নাগের 'পথিক', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে', যুবনাশ্বর 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'তে এই প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করা যায়। মার্কসীয় সমাজচেতনাও বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'উপনয়ন', 'মিছিল' উপন্যাসে

সমাজ চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক চেতনা। আঞ্চলিকতা বা রাঢ়বঙ্গের তথাকথিত অন্ত্যজজীবনের আশ্চর্য মর্মকোষ লক্ষ্য করা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-এই উপন্যাসগুলি সরাসরি রাজনীতির সম্পর্ক বর্জিত হলেও সমাজ চেতনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুন্দর সমাজচিত্রণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' সমাজের দুঃখময় অথচ প্রাণচঞ্চল জীবন স্রোতের পরিচায়ক। বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা কথাটি সবচেয়ে বেশি তাৎপর্য বহন করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনচিত্রণে। দেশভাগ, নারীর স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ, কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যায় এই পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে। এরই মধ্যে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চকে আবর্তিত করে রাজনৈতিক জীবনধারার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অমোঘ সত্যটি নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিকরা। ফলে, রাজনীতি, সমাজচেতনা বারংবার ফিরে আসে উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। তাই বিষয়বস্তুতে, রূপায়ণরীতিতে, এমনকি ভাষাভঙ্গিতে সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সমাজ চেতনা ও রাজনীতির যুগ্ম সহায়ক বলা যেতে পারে।

KEY WORDS

রাজনীতি,সমাজনীতি,বিবেকবুদ্ধি ও আত্মশক্তির উত্তরণে বাংলা উপন্যাস বিচিত্র আত্মচেতনার বিকাশভূমি।

মূলপ্রবন্ধ-

সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রূপেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিক কালের সময় সংক্ষিপ্তির যুগে বিশাল ব্যাপক মহাকাব্য পাঠের সুযোগ নেই, তাই আধুনিক সাহিত্যের সর্বোত্তম বাহন উপন্যাস ও ছোটগল্প।এর মধ্যে উপন্যাসকে ব্যক্তিমন, মানবসমাজ ও নতুন আশা - আকাঙ্খার আকর্ষণে রুচি ও যুগধর্মের প্রতীক বলে মান্য করা হয়। সেই জন্য প্রতিভাধর ঔপন্যাসিককে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়ে থাকে । বাংলা উপন্যাসও তার ব্যাতিক্রম নয়।

ইংরেজ শাসনের সভ্যতা ও ভারতীয়ত্ব বা জীবনাদর্শের অভিঘাতে আমাদের দীর্ঘলালিত ঐতিহ্য ও পরম্পরা আহত হয়েছে।পূর্ব অনুসৃত অনুকরণ ও গোঁড়ামির শৃঙ্খল বা মোহ থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদের কৌতুকরস ও আঘাত দেশীয় প্রবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করলো , তখনই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হলেও সমাজ -পরিবেশের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য তা সাহিত্যের বিষয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে।'নববাবু বিলাস','আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' র মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে ভাবী উপন্যাসের ভূমিকা বা সূচনা হলো ।[১] বাংলা সাহিত্যের এই নতুন মাধ্যমটির সূচনা সার্থকরূপে দেখা দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে।১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে আরম্ভ করে 'সীতারাম' (১৮৮৬) পর্যন্ত ব্যাপ্ত উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আদর্শ বা তত্ত্ববিষয়ক বার্তা বহন করে।পরবর্তীকালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ , যোগেশচন্দ্র বসু , ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঔপন্যাসিকরা তাঁদের

রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার পরিবর্তে সাধারণ বাস্তব সমাজের নরনারীর সাধারণ সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেন।এই উপন্যাসগুলিতে ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে সামাজিক সমস্যাও আলোচিত হয়েছে।তবে তা প্রখরভাবে নয় ।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম প্রবর্তিত রীতির পরিবর্তে বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করলেন ।ফলে বাংলা উপন্যাস রোমান্সের ও ইতিহাসের আলোকিত জগৎ থেকে অবতরণ করে আধুনিক সমাজের সমস্যা-জটিল জগতে পদার্পণ করলো । রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্বাভাবিক ও সহজ ধীর প্রবাহটির অনুসরণ করেছেন ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।প্রাত্যাহিক জীবনের গ্লানি ও বিক্ষোভ সবিস্তারে বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ চিত্রটিকে আরও বিস্তৃত করে তুলেছেন।ভাষা ও আঙ্গিকেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায় । এই সমস্ত বুদ্ধিধর্মি বিশ্লেষণের যে রীতি তিনি প্রবর্তন করলেন তাতেই বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার সূত্রপাত হলো ।

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে রাজনৈতিক সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে বলে উপন্যাসটি সেকালে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।সে সময়ের হিংসা আশ্রয়ী বিপ্লবী আন্দোলনকে উপন্যাসে সমালোচনা করা হয়েছে । ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজে ধীরে ধীরে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মেঘ জমতে থাকে। ইংরেজের প্রভুত্ব স্বীকার করে ভারতবাসী আর শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি স্বীকার করতে চাইলো না ।১৮৭০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই নব্য জাতীয় উদ্দীপনা সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বনিয়ন্তা শক্তিরূপে রাজত্ব করেছিল।বঙ্কিমচন্দ্রের ‘লোকরহস্য’, ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভারত সংগীত’, ‘ভারতভিক্ষা’ এই সময়ের রচনা। নাটক ও স্বদেশী সংগীত রচিয়তা জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য স্বদেশপ্রেমিক কর্মীবৃন্দও এ যুগেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই স্বদেশী গান ও স্বদেশী মেলার মধ্য দিয়ে সে যুগের মানুষের গভীর জাতীয়তা বোধ উদ্দীপিত হয়েছিল ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। সে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বিদেশি দ্রব্যাদি বর্জন ও ইংরেজ শাসকগনের সঙ্গে অসহযোগিতা। কিন্তু শ্রী অরবিন্দের লক্ষ্য ছিল বিদেশি শাসনের উচ্ছেদ করা। ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ে জ্বলন্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন । রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ প্রেমের নামে উগ্র জাতীয়তাবাদের রক্তাক্ত পরিণাম কখনোই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ‘গোরা’ উপন্যাসে এই মনোভাবের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। গোরা যেন ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। বলিষ্ঠ চরিত্র ও প্রবলতর কণ্ঠস্বরে সে প্রথমদিকে ঘোষণা করে যে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ।কিন্তু পরে সে ঘোষণা করেছে বিশ্বচেতনাবোধ ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও একতার।

স্বাধীনতা ও স্বাদেশিকতার নাম করে যে নির্জলা হিংসাত্মক প্রমত্ততা শুরু হয়েছিল, তারই স্বরূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'ঘরে বাইরের' মধ্যে।এই উপন্যাসের মধ্যে উগ্র রাজনীতি বা স্বাদেশিকতার বিকৃত রূপ ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের রাজনীতির ভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছেন।এটি তার সমাজচেতনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

'ঘরে-বাইরের' পরে রচিত 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন উগ্র জাতীয়তাবোধের কবলে পড়ে নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক ও স্বরূপ কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে।এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুটি- অতীন্দ্র ও এলা তথাকথিত দেশসেবার জন্য নিজেদের মানবধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল, কিন্তু তার আঘাত ও বিশ্বাস ভঙ্গের বেদনায় আকীর্ণ হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত জীবন। রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তাঁর রাজনৈতিক চেতনার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর আসমুদ্র হিমাচল প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।সেদিন রবীন্দ্রনাথ মহামান্য বড়লাট প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করে সরকারকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের চিরস্মরণীয়। বঙ্গভঙ্গ যুগে এবং পরবর্তীকালের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের যুগে নানা প্রবন্ধে তিনি গুপ্ত ষড়যন্ত্র বিদেশী দ্রব্যনাস প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজের নিন্দা করেছেন।এজন্য তাকে অনেক বিরূপ মন্তব্যও শুনতে হয়েছিল। রাজনীতি সম্বন্ধে যে বিশেষ আদর্শে তিনি অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, সেই আদর্শকে জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন।তবুও রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনার প্রথম পথপ্রদর্শক বলা যায়।[২]

বাংলা সাহিত্যে যে রাজনীতি প্রধান উপন্যাসটি প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'।[৩] 'পথের দাবী' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গবাণী পত্রিকায় ১৩২৯ সনের ফাল্গুন মাস থেকে ১৩৩৩ সন বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয় । গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর (১৩৩৩ ভাদ্র, ১৯২৬ সাল) কয়েকদিনের মধ্যে মুদ্রিত সমস্ত কপি বিক্রি হয়ে যায়।একদিকে যেমন সাধারণ পাঠক, লেখক, প্রকাশক (উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) নিঃশঙ্ক ছিলেন ও সরকারি প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অন্যদিকে সরকারি মহল থেকে নানা আলোচনার ও রিপোর্টের ভিত্তিতে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মুখ্য সচিব প্রেন্টিস সাহেব 'পথের দাবী' উপন্যাসটিকে বাজেয়াপ্ত করার সরকারি নির্দেশ দিলেন। এই উপন্যাসে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূল ও দক্ষিণ পূর্ব উপকূল অতিক্রম করে সুদূর বার্মা দেশে একটি অস্‌ফুট প্রেমকাহিনীর মধ্যে সমাপ্ত হলো। এই উপন্যাসে সব্যসাচী দেশের জন্য সকল রকম ছদ্মবেশ ও কাজকর্ম করতে প্রস্তুত। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন বিপ্লবীর জীবনের ছায়াপাতও এখানে ব্যক্ত হয়েছে।সেকালে দেশ মাতৃকার ডাকে অসংখ্য গৃহহারা, প্রতিভাসম্পন্ন, মৃত্যুভয়হীন ছেলে আত্মদান করেছিল- শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী যেন তাদেরই প্রতিভূ। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তার গার্হস্থ্য ও বাৎসল্যরসপ্রধান উপন্যাসধর্মিতা ত্যাগ করে কালোত্তীর্ণ একটি রাজনৈতিক ও সমাজসচেতন ভাবের জন্ম দিলেন ।

বাংলা উপন্যাসের সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সমাজসচেতনতার যে রূপ দেখা গিয়েছিল বলা যায়, তার এক ধরনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এপর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিত হিসেবে দেখা গেছে মুখ্যত মধ্যবিত্ত সমাজকে কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনের প্রবাহে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ও ভূমধ্যকারী সমাজের যে আলেখ্য ছিল তা ক্রমশই সরে এসেছিল। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজে এবং উপন্যাসের মূল চরিত্র ও তাদের ব্যক্তিসম্পর্ক তথা সমাজ সম্পর্কের সমস্যা শিল্পরূপ-লাভ করেছিল কলকাতা কেন্দ্রিক নতুন জীবনচেতনার নানাবিধ সংঘর্ষভূমিতে।সেই সমাজ কখনও ছিল হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের সংঘর্ষে আন্দোলিত, কখনো আবার গ্রাম্য সংকীর্ণতা ও অজস্র অন্ধ কুসংস্কারের জটিল পাঁকে আবদ্ধ।জাতিভেদ , জ্ঞাতিকলহ , লুপ্তপ্রায় যৌথ পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশা, সুদীর্ঘ পরাধীনতার জন্য সমাজের রুদ্ধস্বভাব এবং সেই সঙ্গেই আবার নতুন জাতীয়তাবোধের আন্দোলন। তাই এই কাল সীমায় রচিত উপন্যাসগুলি সমাজ সচেতনতার পরিচায়ক। এই উপন্যাসগুলির একটি বড় অংশই রচিত হয়েছিল সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা তরুণী বা স্বামীহারাদের প্রণয় সমস্যা নিয়ে । এই দৃষ্টান্তগুলি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন ছিল তেমনি পরিমাণেই ছিল শরৎচন্দ্র, প্রভাত কুমার, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী -দের উপন্যাস জগতেও।[৪] একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে বাংলা উপন্যাসের এই সমাজের চরিত্র ও চিত্র ছিল দুর্ভেদ্য, অনড়, অচল এক প্রাচীর বেষ্টনীর মতো। ব্যক্তির পারস্পরিক বা সামাজিক সম্পর্কের সমস্ত উপস্থাপন ও আলোচনা হতো সমাজের এই অপরিবর্তিত রূপটিকে মনে রেখেই।

কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর সমাজে দেখা গিয়েছে একটি চলমান ও সহিষ্ণু পরিবর্তমান সত্তা। তাই উপন্যাসে দেখা গেছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক। কোনটিই কোনও অনড় অচল বিধিনিষেধের আয়তনসীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, সমাজের যেসব শক্তি নিয়ত সমাজকে বিবর্তনমুখী করেছে সেই সমস্ত শক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছে। শরৎচন্দ্র ‘পল্লীসমাজে’ প্রশ্ন তুলেছিলেন, মানুষ সমাজের জন্য, না সমাজ মানুষের জন্য- কিন্তু তার কোনও স্পষ্ট উত্তর দেবার দায় স্বীকার করেননি। কারণ সাহিত্যিক সমাজ সংস্কারক নন, সমাজের ভালো-মন্দ, ন্যায় অন্যায়কে পাঠকের বোধ-বুদ্ধির দ্বারে উপনীত করেন মাত্র।[৫]

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যে লেখকরা রবীন্দ্র সাহিত্যাঙ্গন অতিক্রম করে নতুন ধারার পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্রতী হলেন, তাঁরা একদিকে যেমন দেখালেন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনের রূপও অবশ্য পরিবর্তনীয়,তেমনি অপরদিকে সাহিত্যকে নিয়ে এলেন মধ্যবিত্ত সমাজনীতির শৃঙ্খলা ভেঙে একেবারে সমাজনিন্দিত প্রত্যন্তবাসী নারী পুরুষের মাঝখানে, যেখানে সমাজ-পরিত্যক্ত সাধারণ বারবণিতার জীবনও ঔপন্যাসিকের ও সাধারণ পাঠকের সকৌতূহল সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। আবার স্বচ্ছল সমাজে শিক্ষিতা যুবতী তার শিক্ষা ও রুচির সঙ্গে যখনই অসহিষ্ণু সমাজের বিবাদ বা সংঘর্ষ বেঁধেছে, তখনই বিনা দ্বিধায় স্বচ্ছন্দে

গৃহসংসারের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেছে । বাংলা উপন্যাসে সমাজ চেতনার এই দিক পরিবর্তনের সূচনা হয় নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের রচনায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নরেশ চন্দ্রের নির্ভীক দৃষ্টিকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন 'আপনার ভয় ডর নাই' । অর্থাৎ নরেশ চন্দ্রের রচনায় সমাজের রক্তচক্ষুকে অতিক্রম করে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের প্রয়াস স্বীকৃত হয়েছে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শুভা','পাপের ছাপ','শাস্তি', 'মেঘনাদ', 'লুপ্তশিখা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্যে বিভিন্ন স্বভাবের নবশিক্ষিতা নায়িকার শিক্ষা ও রুচির সঙ্গে সমকালীন সমাজনীতির বিরোধের পটভূমিকায় সেই নায়িকাদের দুঃসাহসিক জীবন যাপনের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। অপরদিকে 'অভয়ের বিয়ে' এবং 'তারপর' উপন্যাসের নায়িকা মায়ার আধুনিক রুচি পারিপার্শ্বিক সমাজে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, নরেশ চন্দ্র তার মধ্য দিয়ে সমাজের গতিমুখের নিশানা দেখাবার চেষ্টা করেছেন এবং শহরের শিক্ষিতা মেয়েকে গ্রাম্য পরিবেশে স্থাপন করে, শহর ও গ্রামের সমাজনীতির বিরোধ ও মীমাংসার ছবি এঁকেছেন। গ্রাম ও শহরের এই সম্পর্ক ও সংঘর্ষে সামগ্রিকভাবে সমাজে যে সচলতা দেখা দিয়েছিল, প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি নরেশচন্দ্র সেই সচল সজীব সমাজকেই দেখিয়েছেন তাঁর 'সর্বহারা','পথের পরিচয়' ইত্যাদি উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রত্তোর পর্বের প্রথম স্তরে শিক্ষিতা নায়িকার যন্ত্রণাহত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, কেন ক্রমশ তাদের মনে একটা অনিকেত মনোভাব গড়ে উঠেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বাংলা সাহিত্যে ততখানি প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি, যতখানি পড়েছিল ইউরোপে। তবুও ইউরোপীয় সাহিত্যের সূত্রে পাওয়া সেই যুদ্ধোত্তর অসহিষ্ণু মনোভাব আমাদের মনকে এদেশের বন্ধ সমাজসম্পর্কের বিরোধভূমিকে এমনভাবে আন্দোলিত করলো যে বাংলা উপন্যাসে তার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এ বিষয়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক গোকুল নাগের 'পথিক', অচিন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে' ও যুবনাশ্বের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালীতে'।'বেদে' উপন্যাসে অতৃপ্তকাম নায়ক জীবনের সারার্থক খুঁজতে গিয়ে পরপর আহ্লাদী, মুক্তো, বাতাসী, আসমানী, জ্যোৎস্নাও মৈত্রেয়ীর মধ্যে বিচিত্র ধরনের প্রেমের সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তোর কাছেই সেই মুক্তির বানী শুনেছে ।

কল্লোল গোষ্ঠীর এই লেখকরা তাঁদের উপন্যাসে সমস্ত রকম ধ্রুব সত্যকেই অস্বীকার করেছেন।এমনকি 'বিবাহের বন্ধন অপেক্ষা মনের বন্ধন বড়' — এ কথাও তাঁদের কাছে যথেষ্ট মুক্ত দৃষ্টির পরিচায়ক মনে হয়নি, এমনকি নারীর একনিষ্ঠতা ও প্রেম সম্পর্কেই একদিকে যেমন প্রশ্ন তুলেছেন , অপরদিকে তেমনই অস্থির যাথাবরী বৃত্তিকে সার বলে মনে করায় সমাজ সম্পর্কে একপ্রকার নঞর্থক ধারণাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যা সমাজ-জীবনের সব রকম চলৎশক্তির পক্ষেই বাধা স্বরূপ । অপরদিকে কল্লোল গোষ্ঠীরই লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টি পড়েছে সেই বস্তি জীবনে, সমাজ যাকে কুৎসিত আবর্জনা ছাড়া কিছুই মনে করে না। সংসারের পঙ্ককুন্ড এই বস্তিতেও যে জীবন আছে, যা অভিজাত সমাজের কৃত্রিম নীতির অনেক

বন্ধন থেকে মুক্ত, লেখক সেই জীবনের কঠিন-কঠোর বাস্তবতার মাঝখানেই অশান্ত কর্মকারের মতোই তীব্র জীবনপিপাসায় অস্থির চরিত্রটিকে খুঁজে পেয়েছেন। কালাচাঁদ, পাঁচী, তিনকড়ি, তার বৌ আহ্লাদী, আহ্লাদীর দাদা শশী, নেতা এই চরিত্রগুলি নিয়ে লেখা 'পাঁক' উপন্যাসটি। এদেরই হতশ্রী প্রাত্যাহিকতার বৃত্তে এসেছে অশান্ত কর্মকার, যার সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই লিখেছেন "অশান্ত অনাগত যুগের নতুন মানুষ। এই নতুন মানুষের কন্ঠে দ্বিধা নেই , দ্বন্দ্ব নেই — আমি তো পৃথিবীতে আজ দেখছি দেশ নেই, জাতি নেই, শুধু আছে দুটো বিরাট দল, একটা হচ্ছে যারা অবিচার অন্যায় করে আর একটা যারা পৃথিবীজুড়ে এই পরগাছাদের রসদ জোগায় আপনাদের কলজের রক্ত দিয়ে। আমার কাছে দেশ নেই, স্বদেশী হুজ্জত বুজুরুকি"।[৬] অর্থাৎ অশান্ত কর্মকারের মধ্য দিয়েই বাংলা উপন্যাসে দেখা দিল মার্কসীয় সমাজচেতনা- দ্বান্দ্বিক বস্তবাদের সূত্রানুসারে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, এই প্রভাব তাঁর ঔপন্যাসিক-চেতনায় এসেছিল ম্যাক্সিম গোর্কি'র রচনাবলী থেকে । তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'উপনয়ন', 'মিছিল', 'মহানগর' এই সূত্রেরই সম্প্রসারণ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অসহযোগ আন্দোলনোত্তর কলকাতার একটি মেস বাড়িকে কেন্দ্র করে মিছিলের যে ঘটনাবর্ত রচিত হয়েছে, তাতে স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হয়েছে তখনকার বেকার জীবনের যন্ত্রণা, বৃদ্ধ নন্দলালের শঠতা ও অন্যান্য দুবৃর্ত্ততা। 'উপনয়ন' উপন্যাসে নকুড় দাস ভিখারির অপরিচ্ছন্ন আস্তানা এবং সেখান থেকে বিনুর শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে আসার ছবি এঁকেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। উপন্যাসে সমাজচেতনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক চেতনা। 'মহানগর' উপন্যাসে কলকাতাকে দেখেছেন আধুনিক জীবনের যাত্রার এক উত্তাল প্রতীক হিসেবে। "আমার সঙ্গে এক মহানগরের পথে, যে পথ জটিল দুর্বল মানুষের জীবন ধারণের মত, যে পথ অন্ধকার মানুষের মনের অরণ্যের মত, আর যে পথ প্রশস্ত আলোকজ্জ্বল মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মত। এই মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত, ভয়াবহ , বিস্ময়কর সংগীত।"[৭]

নগরজীবন তো ইট পাটকেলের জগৎ নয়, ইট পাটকলের আবেষ্টনীতে বেড়ে ওঠা মানুষের জীবন। মানুষের জীবন চলমান, প্রগতিশীল, সেই প্রগতির কাহিনী অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে অসীম রায়ের 'আবহমানকাল' উপন্যাসে।

" বারে বারেই কলকাতার রাস্তায় বিপ্লবের জোয়ার আসে তেমনি প্রবল ভাঁটার কাঁদায়, স্থান কাল গেড়ে বসে । ক্লান্তিতে অবসাদে মুখ থুবড়ে থাকে শহরটা । চৌরঙ্গী আর পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরায় সাহেবদের আসন দখলকারী ভারতবর্ষের নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের

ছেলেমেয়েরা ফূর্তি উড়ায়, শেয়ালদা স্টেশনে রিভিউজির ভিড় বাড়ে । এই শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে এক প্রবল দ্বৈত সত্তায় টলমল করে টুটুল।"

কিন্তু এই মহানগর নিয়ে কেবল রোমান্স বা রাজনীতি করাই চলে না, অগণিত মানুষের জীবন সংগ্রাম বা জীবন সংঘর্ষের বর্ণনা করাই চলেনা, এর প্রতীকি অভিধা এর সম্পূর্ণ অভিধা নয়। এই মহানগরের আরেকটি সত্তাও আছে, আতঙ্কিত, শিহরণ জাগানো রূঢ়, বেদনার্ত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ বাস্তব সত্তা।এই বাস্তব সত্তার অবিস্মরণীয় চিত্রণ পাই 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত (পরে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত) যুবনাশ্ব বা মনীশ ঘটক রচিত 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'তে। এই জাতীয় চিত্রণের সঙ্গে কেবল ভিক্টর হুগোর 'লা মিজেরেবেল' ও ডিকেন্সের 'ব্লিক হাউস' অথবা এমিলিয়ে জোলার 'লা আসসোমায়া'রই তুলনা করা চলে।

গ্রাম বা শহরের জীবনের বাইরেও মানুষের জীবনের বিস্তৃতি কম নয়, আধুনিক উপন্যাসে চোর ডাকাতের গল্প, যুদ্ধ বিগ্রহের গল্প যেমন বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে, তেমনই অনেক বেশি রুদ্ধশ্বাস ও কৌতূহল উদ্রেককারী বিষয় হলো রাজনীতি। অনেককাল থেকেই যুদ্ধের শিল্পিত রূপ দেখতে বাঙ্গালী অভ্যস্ত । যুদ্ধবিগ্রহের পরম আত্মীয় হলো রাজনীতি। আজকের দিনে নানা মতের ও নানা পথের রাজনীতিও সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা, সম্পর্ক ও ক্রিয়াকাণ্ড ভারতীয় জাতীয় জীবন থেকে দূরে নয়। সুতরাং রাজনীতিও বাংলা উপন্যাসের একটি বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় গোপাল হালদার লিখিত 'একদা' (প্রকাশ ১৯৩৯) উপন্যাসটিকে। সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, যুক্তিনিষ্ঠায় ও বস্তুবাদে আস্থা স্থাপনকারী লেখক ১৯৩৩ এর ১৩-২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি অবস্থায় লেখেন। এটি একটি ত্রয়ী উপন্যাস। পরবর্তী দুই খন্ড ১৯৫০ এ লেখা 'অন্যদিন' এবং 'আর একদিন'।[৮]

স্বদেশের সমকালীন রাজনৈতিক বিপ্লব চেতনা ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের পটভূমিকায় জীবনের নিগূঢ় সার্থকতার সন্ধান 'একদা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তিরিশের দশকে সারা বিশ্বজুড়ে যে দারুণ অনিশ্চয়তা ও সংকটের মুখে কমিউনিজম-সোশ্যালিজমের বাণী এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্গত জনসাধারণের মনে যে প্রবল আশ্বাস সৃষ্টি করেছিল তার ছায়া পড়েছিল বাংলা উপন্যাসে। এই দশকের একটি বুদ্ধিজীবি অন্তর্মুখী তরুণ মনের ওপর সমকালীন প্রবল জীবন-আবর্তের প্রতিক্রিয়া, চিন্তা-মনন ও জীবন-জিজ্ঞাসার তীব্র চেতনা এই গ্রন্থের মূল আশ্রয়। একদিনের ঘটনা নিয়ে লেখা উপন্যাসের আঙ্গিকটিও অভিনব। বিশেষ এক দেশ কালের পরিবেশে অমিতের জীবন-প্রত্যয় ও মূল্যবোধ তার সত্তাকে আন্দোলিত করেছে।সুতীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও অন্তর্দাহের চিত্রই উপন্যাসটিকে তাৎপর্য দান করেছে।

রাজনীতিকে তথা সমাজবাদকে কেন্দ্র করে যেমন উপন্যাস লেখা শুরু হয়েছে। তেমনই সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় কয়েকজন ঔপন্যাসিক সমাজগত ধারণার বেষ্টনিভেদ করে

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে সমগ্র বিশ্বের বিশেষ করে প্রাচ্য ভারত ও পাশ্চাত্য ইউরোপের সম্মিলিত মানব সমাজের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে, তাদের জীবন ও সমাজের অলেখ্য বর্ণনা করেছেন। এসব উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা সমাজ বলতে যেন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে সমগ্র মানব সমাজকেই বুঝতে চেয়েছেন। জীবন সমস্যা বলতেও তারা মনে করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের মিলিত সমস্যা এবং জীবন বলতে জাগতিক পটভূমিতেই ব্যক্তিজীবন।এই পথের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রধান হলেন দিলীপ কুমার রায় ও অন্নদাশঙ্কর রায়। দিলীপ কুমার রায় 'মনের পরশ', 'রঙের পরশ', 'বহুবল্লভ'ও 'দুধারা' প্রভৃতি যে উপন্যাস গুলি লিখেছেন তার সবগুলোই ইউরোপের পটভূমিতে বাঙালি ও ইউরোপীয় চরিত্র নিয়ে গঠিত। সব উপন্যাসেই দেখা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ নরনারীর প্রেমকে কিভাবে দেখেছে, উভয় সমাজেই প্রেমের মূল্য ও সমস্যার প্রকৃতিটি কি — এই নিয়ে পাত্র-পাত্রীরা (উপন্যাসের) ভাবনা চিন্তা করেছে ও নিজেদের জীবনের উপলব্ধ সত্য দিয়ে সেই প্রেমের প্রতি সামাজিক মনোভাবের সত্যতা যাচাই করেছে। ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে প্রেম সম্পর্কে কি ধরনের জটিলতা দেখা দেয়, তাও পরীক্ষিত হয়েছে। তেমনি সেইসঙ্গে উভয় সমাজের সমালোচনাও করেছেন প্রচুর তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে। কথাসাহিত্যকে গভীরতর সমাজ- চেতনার বাহন করে তোলার জন্য শিল্পীর প্রচেষ্টা স্বতন্ত্র ও অভিনব।

অন্যদিকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রয়াস সংস্কার ও যুক্তির।'সত্যাসত্য'(১ম, ১৯৩২)র চরিত্র বাদল সেন তাই প্রশ্ন করেছেন-

"মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিজেকে চালিত করতে পারে?"

ধূসর অতীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বর্তমান ও দূর ভবিষ্যৎকে, বাঙালির সঙ্গে বিশ্বকে, বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন ও আদর্শ মেলাতে চেয়েছেন তিনি। আর এই সংযোগ সমন্বয়ের পটভূমিতে আছে মননদীপ্তি এবং যৌবন ধর্মের উপর অবিচল বিশ্বাস। ১ম যুদ্ধোত্তর অস্থির অশান্ত মানুষের জটিল জীবনের বিচিত্র প্রশ্ন ও নিরীক্ষণের সংকল্প ও ব্যর্থতার, নূতন আদর্শ ও মূল্যবোধের সন্ধান প্রয়াসের ইতিবৃত্তকে এক মহাকাব্যোচিত বিশাল পটে উৎকীর্ণ করে তোলার তীব্র বাসনা অন্নদাশঙ্করকে এপিক উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত করে। তাঁর 'সত্যাসত্য' (১ম, ১৯৩২), 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩), 'রত্ন ও শ্রীমতি' (১৯৮০), ক্ষুদ্রায়ত উপন্যাস "অসমাপিকা" (১৯৩০)- জীবনের ছোট সুখ-দুঃখ, বাসনা-অসঙ্গতির ছবি এসব কাহিনীতে অঙ্কিত হয়েছে। আর যুদ্ধোত্তর কালের বিশৃঙ্খলা ও অস্থির মানুষের দ্বিধা সংশয়ের মধ্যে দিয়ে তা-ই সংহত ও বিস্তৃত হয়ে এযুগের মহাকাব্যের বাতাবরণ রচনা করেছে। আর এই ঐক্য বন্ধনের প্রধান সূত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়।

শরৎ সাহিত্যের উত্তরসূরী,আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রথম লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কয়লাকুঠি' উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। অন্ত্যেবাসী কয়লাশ্রমিকদের সংগ্রামী ও দীনদরিদ্র জীবনের পটভূমিকায় লেখা গ্রন্থটিতে সাঁওতালি ও

দিনমজুর সমাজের নরনারীর জীবনসমস্যার বিচিত্র দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। লেখকের বাস্তববোধ নিরাসক্ত। কয়লা খনির তথাকথিত ঘৃণ্য রাজনীতি, অবিশ্বাস, সংকীর্ণ জীবন পরিবেশের মধ্যে সহায় সম্বলহীন যেসব মানুষের বাস তাদের প্রতি সহানুভূতি ও মমতায় বলিষ্ঠ জীবনে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের যুগসন্ধি ও ভাঙ্গনের পটভূমিতে যৌবনের স্বপ্ন আদর্শ, আবার যৌবনেরই করুন অবক্ষয় ও ব্যর্থতা লেখকের শিল্প সৃষ্টির নেপথ্যে নিগূঢ়ভাবে বর্তমান। যৌবনের যে দুর্মর প্রেরণা মানুষকে গৃহছাড়া করে সেই যাযাবরী জীবনের শিল্পী প্রবোধ কুমার সান্যাল উপন্যাসের পটভূমি ও বিষয়বস্তুকে ব্যাপ্তি দান করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশের মাটির কোন প্রত্যক্ষ সংস্রব ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশকে কোনও দিক দিয়েই রেহাই দেয়নি। তাই যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাংলা সমাজ ও সাহিত্য তুল্যরূপ হয়ে উঠল ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে। পৃথিবী জোড়া মূল্যবোধের ভাঙ্গন ও সমাজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন রূপ তাই বাংলা উপন্যাসকেও সরাসরি প্রভাবিত করল। তখনকার প্রায় সমস্ত ঔপন্যাসিকদের কলমেই রূপ নিল যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাংলার শহর ও গ্রামের ব্যাধিগ্রস্থ ও ব্যভিচারময় বিপন্ন সমাজ।[৯]

এই সর্বাত্মক নীতিহীনতার সময়ে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের সঠিকভাবে চরিত্রগত নীতিহীনতার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। তার ‘কলরব’, ‘প্রমীলার সংসার’, ‘নবীন যুবক’ ইত্যাদি উপন্যাসে। ‘কলরব’—এ লেখক দেখিয়েছেন "একটি বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের একটি ঘোলা আবর্ত। আর্থিক অসঙ্গতির পটভূমিতে মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মমর্যাদা রক্ষার কঠিন আঘাতে দামিনী, শংকর ও রিনার মতো বিভিন্ন মানুষের ব্যর্থতার বিভিন্ন রূপ ফুটেছে।"এই একই বিপর্যয়ের সামাজিক পটভূমিতে লেখা ‘বনহংসী’(১৯৩১) উপন্যাসে দ্বিজেনের মুখে শোনা যায় সেই সময় মানবিক মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ার কথা—"তুমি তো যুদ্ধে গিয়েছিলে, আমাদের খবর রেখেছিলে কিছু ? বোমা পড়বার ভয়ে আমরা কোথায় চলে গিয়েছিলুম, দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কেমন করে চলল, কন্ট্রোলের চাল ধরতুম কেমন করে, কাপড়ের জন্য ছুটতুম কোথায়, কয়লা আনতুম কোন কায়দায়, বছরের পর বছর কী অশান্তিতে কেটেছে, রেশন পাবার জন্য কী মারামারি—এসব জেনেছো কখনো ? আমি কি একা? হাজার হাজার ছেলে কীরকম খারাপ হয়ে গেছে জানো ? লেখাপড়া এক মুঠো ভাত আর একখানা কাপড়ের জন্য দিন রাত এখানে ওখানে হানাহানি আর দাঙ্গা তুমি খবর রেখেছিলে কিছু ?"

যেসব ঔপন্যাসিকের রচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও কল্লোলকাল পর্ব সংহতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পেরেছিল তাদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। জীবনের জটিল বাস্তবতার নিরাসক্ত বিশ্লেষণকে শিল্পী জীবনের পরমার্থ রূপে গ্রহণ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জননী'ইত্যাদি উপন্যাসে তিনি ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার প্রয়োগে মধ্যবিত্ত সমাজের স্ববিরোধী, ভন্ডামি ও স্বেচ্ছাচারকে তুলে ধরেছেন। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় তিনি উপন্যাসের গাউদিয়া গ্রামের ঘূণ ধরা সমাজের সর্পিল টানাপোড়েনের চিত্র এঁকেছিলেন। শশীর চোখ দিয়েই লেখক দেখিয়েছেন গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গে কি নিদারুন ক্ষত দেখা দিয়েছে। তাই তিনি জীবন ও সমাজে একপ্রকার জোয়ারের পরিচয় পেলেন উত্তাল পদ্মার ভাঙ্গাগড়াময় স্রোতধারার সঙ্গে বিচিত্রভাবে সুখে- দুঃখে-হতাশায় ও স্বপ্নে জড়ানো মাঝি-মল্লাদের জীবনযাত্রায়। নায়ক কুবেরের জীবনে অভাব ও প্রেমদ্বন্দ্বের জটিলতা পদ্মার ঢেউয়ের মতোই ঘূর্ণিপাক রচনা করেছে এবং এক দুর্জ্ঞেয় নিয়তির মতই হোসেন মিঞা তার ময়না দ্বীপের বসতি রচনা করার জন্য তাকে নিয়ে গেছে। জীবনের সঙ্গে সজোরে এই লড়াই, একদিকে হোসেন মিয়ার কল্পিত দ্বীপের স্বপ্ন ও নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন, অন্যদিকে কুবেররা যেন তার সুতোয় বাঁধা প্রবল কামনাময় মানুষ।[১০]

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনচেতনা এখানেই শেষ হয়নি। তাঁর তীব্র বাস্তব সচেতন মন ক্রমে মার্কসীয় সাম্যবাদ ও সমাজদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন করে সমাজকে দেখার শক্তি অর্জন করেছিল। তাই শ্রেণী সংগ্রাম তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে সমাজের অগ্রগতির রেখাপথটি নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। তার 'শহরতলী', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', 'মাঝির ছেলে' ইত্যাদি উপন্যাসে এই লক্ষণগুলি পরিস্ফুট। 'হলুদবন সবুজবন' উপন্যাসে সুন্দরবনের কৃষিজীবি ঈশ্বর বাগদির কলকারখানার মজুরে পরিণত হয়ে যাওয়ার কাহিনী সূত্রে গোটা অরণ্য-নির্ভর কৃষিসমাজেরই অনিবার্য পরিণতির দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন। এইভাবেই ধনী মালিক ও দরিদ্র শ্রমিকের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত সমাজের চিত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয় উঠেছে বাংলা উপন্যাসে।

বর্তমান বা আধুনিক যুগের পরিবেশেও এই সত্যটি একটি অমোঘ প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে। আরেকটি উপন্যাস 'শহরতলীতে'(১৯৩৯) প্রথমে একজন গৃহবধূর শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করবার প্রয়াস দেখা যায় —

"পরদিন দুপুরবেলা, ডাক আসিল যশোদার, মিলে মজলিস বসিয়াছে, একবার যাইতে হইবে যশোদাকে। কাশীবাবু নিজে গাড়ি নিয়া আসিয়াছে ।

আমি গিয়ে কি করবো ?

আপনি মাতিয়ে দিয়েছেন ওদের, আপনি না গেলে ওরা কারো কথা শুনবে না।

যশোদা উদাস ভাবে বলিল— ওদের দাবি মিটিয়ে দিলেই কথা শুনবে।

সেই তো সমস্যা দাঁড়াই আছে এখন। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের দাবি বাড়িয়া গিয়েছে, দশজন বরখাস্ত শ্রমিককে ফিরাইয়া নিলেই আর চলবে না, আগেরবার যেসব দাবি উপলক্ষে ধর্মঘট বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই দাবিগুলিও মিটাইয়া দেওয়া চাই। আপনার পরামর্শে এটা হয়েছে।"[১১]

রবীন্দ্রত্তোর উপন্যাসে সমাজচেতনা ও সমাজচিত্রণের প্রাধান্যে যিনি বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সমাজ চেতনা রূপটি ছিল তাঁর নিজস্ব। নায়ক নায়িকার ব্যক্তিগত প্রেম সমস্যা নয়, প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ সমাজের পটভূমিকায় নায়ক অথবা নায়িকার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও পরিণামই তারাশঙ্করের উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। বস্তুত ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল সাহিত্য সাধনায় তারাশঙ্কর সমকালীন বাংলাদেশের, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের সমাজ জীবনের বিবর্তনের যে সর্বাঙ্গীণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই অসাধারণ কৃতিত্বে তাঁর তুলনা নেই। যুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি যে কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিঘাতে সমাজের অতি প্রত্যন্ত প্রদেশেও যে তরঙ্গ-উপতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তারাশঙ্কর তাঁর শক্তিশালী কলমে তা বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি তারাশঙ্করের কলমেই বাংলা উপন্যাসে সমাজ চেতনার সীমানা প্রসারিত হয়ে রাঢ় বঙ্গের তথাকথিত অন্ত্যজ জীবনের আশ্চর্য মর্মকোষের ঠিকানাও চিহ্নিত হয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ও 'মন্বন্তর'—এই উপন্যাসপঞ্চকে বাঙালি সমাজের এক ক্রান্তিকালীন চিত্র এঁকেছেন। ক্ষীয়মান জমিদারতন্ত্র নতুন ধরনের ধনতান্ত্রিক আক্রমণে কিভাবে বিপর্যস্ত ও ধ্বংসোন্মুখ হয়েছে তা রীতিমত সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে পরিস্ফুট করেছেন। 'কালিন্দী' উপন্যাসে, মিল ম্যানেজার মুখার্জী সাহেবের কাছে জমিদারের পরাজয় ঘটেছে আর অহীনের সাম্যবাদী আদর্শের ঘোষণায় ভাবীকালের পদধ্বনি শোনা গেছে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথও তেমনি জমিদার বংশের সন্তান হয়েও তার উত্তরাধিকার বহন না করে নতুন জীবনাদর্শে দেশমাতৃকা তথা ধাত্রীদেবতার পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে।'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' অর্থনৈতিক আঘাতে পল্লী সমাজের মধ্যে যে সর্বাত্মক ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। প্রাচীন জমিদারের আভিজাত্য লোপ, নানা কুসংস্কার ও মিথ্যা আভিজাত্যের মোহ-রূপ, উঠতি বিত্তশালী শ্রী হরিপাল ওরফে ছিরুপালের জনকল্যাণ সাধনের অহমিকা ,অনিরুদ্ধ কামারের দৃপ্ত অভিমান, আবার তারই মধ্যে গ্রাম্য সাধারণ মানুষের ঈর্ষা, বিদ্বেষ, লোভ, শঠতা সব মিলিয়ে দেবু পন্ডিতের আদর্শ সমাজ রচনার স্বপ্ন ও আপোষহীন মনোভাব কিভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উত্তর রাঢ়ের পল্লী সমাজের সেই অবক্ষয়ের ছবি। 'মন্বন্তরে' যুদ্ধকালীন বোমার ভয়ে আতঙ্কিত কলকাতার পটভূমিতে ব্যাধিগ্রস্ত সুখময় চক্রবর্তীর জীবনাবসান এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন কঙ্কালসার পল্লীবাসীদের কলকাতায় আগমন ও ফুটপাতে বীভৎস মৃত্যুবরণ ইত্যাদি চিত্রণের মধ্য দিয়ে কালান্তরের আবির্ভাব।

আবার অন্যদিকে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'কবি', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশঙ্করের সমাজচেতনার ভিন্ন একটি রূপ ধরা পড়ে। রাঢ় বঙ্গের কাহার ও বেদে এবং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী অন্ত্যজ মানুষদের বিচিত্র সমাজ জীবনের চিত্র অকৃত্রিম আন্তরিকতায় উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এদের সমাজেও পরিবর্তনের ঢেউ এসেই

লেগেছে। এদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের রীতিনীতিতেও বিভিন্ন ধরনের সর্পিল ফাটল ধরা পড়েছে এবং সমগ্র বেদে সম্প্রদায়টাই যে আজ অবলুপ্তের মুখে এসব কিছুই বিষন্ন মনোযোগে লক্ষ্য করেছেন লেখক। হাঁসুলি বাঁকের কাহার সমাজে করালী যে নতুন শক্তির প্রতীক হয়ে দেখা দেয়, তা সমগ্র কাহার সমাজের চিরদিনের বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলেই আঘাত হানে, বনওয়ারী তার সর্বশক্তি দিয়েও সে আঘাতকে প্রতিহত করতে পারে না।[১২] বেদে সাপুড়েদের সমাজে যে বিচিত্র ছলচাতুরীর খেলা, একদিকে কামনা ও বিদ্বেষে বিষাক্ত অন্যদিকে সাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো স্বভাবের তেজে উদ্বেলিত এবং এরই মধ্যে কঠিন সংস্কারের বাঁধনে নাগিনী কন্যার জীবনের যে শূন্যতা তাও লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তথাকথিত নীচ জাতীয় ঝুমুর দলের নরনারীদের সঙ্গেও লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'কবি' উপন্যাসে এই অন্ত্যজ শিল্পীদের সীমাহীন দারিদ্র্য ও অসম্মান লেখককে আহত করেছে। তবুও পাঁকের মধ্যে যেমন পদ্ম ফোটে, তেমনি অকৃত্রিম আজিম ও তার মধ্যেও শোভন সৃষ্টিপ্রতিভা বিকশিত হয়। এটা বিস্ময়ের হলেও সত্য। সেই সত্যের উপলব্ধিতেই তারাশঙ্করের সমাজ-চেতনা মহিনামান্বিত। সাঁওতাল বিদ্রোহের বিষয় নিয়ে লেখা 'অরণ্য বহ্নি'তেও এ পরিচয় উজ্জ্বল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রশিষ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'মীরার দুপুর', 'বারোঘর এক উঠোন', 'এই তার পুরস্কার', 'শেষ বিচার' উপন্যাসে সমাজের নীতিহীনতার বিষয়টি শ্লেষের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। 'বারোঘর এক উঠোন' উপন্যাসে আরও বেশি দেখা গেছে যে নারীর দেহ শুচিতা বা একনিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে যেন নিরুপায় হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ মেনে নিয়েছে। উপন্যাসের শেষে শিবনাথ তার স্ত্রীর চারিত্রিক শৈথিল্যকে মেনে নিয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা সাহিত্যের একটি পরিচিত নাম। তার 'চেনামহল'এ পারিবারিক সম্পর্কের শুচিতাও কিভাবে বিনষ্ট হয়েছে তারই অনাবৃত রেখাচিত্র। এই নীতিহীনতা কিরকম বীভৎস হয়ে উঠেছিল, কলকাতার শিক্ষিত ব্যক্তি, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এমনকি অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের মধ্যেও তার অসংকোচ প্রমাণ আছে বারীন্দ্রনাথ দাসের 'লেডি মিরান্দা হোস্টেল'-এ। এই স্খলন অবশ্যই মধ্যবিত্ত সমাজের লোভ-লালসারই প্রতিফলন।

বাংলা সাহিত্যে পাঠকের চোখে 'বনফুল' ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যার ব্যাক্তিনাম আজও উল্লেখ্যযোগ্য। রোমান্টিক ভাবালুতাকে বর্জন করে জটিল মানব চরিত্রের উপর বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মর্মভেদী তীক্ষ্ণ আলোক-সম্পাত করে জীবনের বাস্তব সত্য উদঘাটনের প্রয়াস করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে এক সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ রৌদ্রদৃপ্ত মানবিক গুণের অধিকারী হিসেবে পর্যবেক্ষণ করেছেন । তাঁর 'তৃণখণ্ড'(১৯৩৫), 'বৈতরণী তীরে'(১৯৩৬), 'মানদন্ড'(১৯৪৮) প্রভৃতি উপন্যাসে পরিবেশ শৃঙ্খলিত মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতির বিশৃঙ্খলা ও অসহায় বিভ্রান্তির ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।'মানদন্ড' উপন্যাসে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী তুঙ্গশ্রী ও তথাকথিত

সামন্ত পরিবারের পুত্র হিরণ্যগর্ভর সঙ্গে কলহ ও বাদানুবাদ উপন্যাসের রাজনৈতিক গরিমা বৃদ্ধি করেছে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।[১৩]

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে মানুষের মূল্যবোধ কিভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালোহাত কি করে এগিয়ে এসে গ্রাম্য জীবনে দাবদাহ সৃষ্টি করেছিল, প্রকৃতিমুখী ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা নিয়ে রচনা করেছেন 'অশনি সংকেত'।[১৪]

অবশ্য এই সামাজিক ঘন অন্ধকারের মধ্যেই ঔপন্যাসিকরা আলোকরেখার সন্ধান করেছেন। সেই দুঃসময়ের অপরদিকে তারা দেখতে পেয়েছিলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলন, গণবিক্ষোভ ও জীর্ণ সমাজকে নতুন করে নতুন শক্তিতে বিন্যস্ত করার স্বপ্ন। এসবই যেমন নগরজীবনে, তেমনি পল্লীজীবনেও। এই পরিস্থিতিতেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মন্দ্রমুখর', 'স্বর্ণলতা', 'লালমাটি', 'শিলালিপি' ইত্যাদি। নবেন্দু ঘোষ এরই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়টি যুক্ত করে একে একে লিখেছেন 'ডাক দিয়ে যাই' , 'প্রান্তরের গান', 'ফিয়ার্স লেন', 'নায়ক ও লেখক', এবং 'আজব নগরের কাহিনী'। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বস্তরে তখন রাজনৈতিক চেতনা কত গভীরে মূল প্রেথিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসে।[১৫] একই চিত্র দেখি বনফুলের 'বহ্নি' ও তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা' প্রভৃতি উপন্যাসে। এই নতুন রাজনৈতিক , সমাজনৈতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েই সতীনাথ ভাদুড়ী রচনা করেছেন 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

তাৎমাটুলির একান্ত অনগ্রসর আদিবাসী সমাজে নতুন জীবন বিন্যাসের বোধ কিভাবে জাগতে শুরু করেছে তারই বাস্তব চিত্র এটি। 'জাগরী' (১৯৫৫) কে, বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক বা কারা উপন্যাস বলা চলে। ঘটনার পটভূমি ১৯৪২ সালের ভারত রক্ষা আইন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী বিহারের এক গ্রাম্য আদর্শবাদী শিক্ষক, তার স্ত্রী, দুই পুত্র নীলু ও বিলু এই চারটি চরিত্র নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনী। ভারত রক্ষা আইনে ধৃত ফাঁসির আসামি বড় ছেলে বিলুক কাল ভোরে ফাঁসি হবে। ওই জেলেই অন্য সেলে বন্দী তার বাবা ও মা। ছেলের ফাঁসির আদেশ শুনে এই সংবাদ তার মনে কি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তারই সূত্রে পিছনের ঘটনাকে মায়ের মনের পর্দায় প্রতিফলিত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে ছোট ছেলে নীল বিলু ও তার বাবার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করে, সে জেলগেটে অপেক্ষা করছে ফাঁসিতে মৃত দাদার দেহ গ্রহণ করার জন্য। এই চারজনের চিন্তা ও বৈপরীত্যের পটভূমিকায় লেখক এক অসাধারণ কাহিনী রচনা করেছেন।

এরপরে দেশের ও সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক ঘটনা অর্থাৎ দেশ বিভাগ তথা স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। এই আলো-অন্ধকারময় ফলাফল অনিবার্য ভাবে বাংলা ঔপন্যাসিক

মনকেও আমূল প্রভাবিত করেছে। এই স্বাধীনতা একদিকে যেমন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে অনুকূল পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর করেছে , তেমনি দেশবিভাগজনিত বাস্তুহারা ছিন্নমূল মানুষগুলির জীবনসমস্যা, বিশেষ করে বাংলাদেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং স্বভাবতই বাংলা উপন্যাসে সমাজের এই রাজনীতি-প্রসূত সংকটকালীন সমস্যাও ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজ-সচেতন লেখকরা। বলাবাহুল্য এই সময়কার উপন্যাসে সমাজ ও জীবন চেতনা কাল সীমানার নির্দিষ্ট পটে না থেকে ইতিহাসের সুদীর্ঘ বিবর্তন-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাজনীতি সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যাই বিশ্লেষিত হয়েছে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। একালের এই ব্যক্তিক সমস্যাগুলিতে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য দান করেছেন অপেক্ষাকৃত অগ্রজ ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র । তাই তাঁর উপন্যাসে স্বভাবতই দেখা যায় ঐতিহাসিক তাৎপর্য। ‘রাজা বদল’, ‘চলো কলকাতা’, ‘রাগ ভৈরব’ কিংবা ‘আসামী হাজির’ একালের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও পরিবারিক জীবনের মর্মান্তিক অসংগতির ঔপন্যাসিক রূপ। ‘সাহেব বিবি গোলাম’ সমাজের একটি স্বামীসঙ্গবিধুরা প্রেমিকাস্ত্রীর চরিত্রকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করার প্রথম প্রয়াস। ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’, ‘একক দশক শতক’, ‘বেগম মেরী বিশ্বাস’ রচনা করে গত দুশো বছরের বাঙালি সমাজের বিবর্তনের একটি রূপরেখা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কোন সমাজদর্শনের বিশেষ মতবাদ গ্রহণ না করে তিনি ব্যাপকভাবে সমাজের পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং তার বিশ্বাসযোগ্য চিত্র এঁকে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।[১৬]

এ পর্বের লেখকদের মধ্যে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার মধ্যে নিমাই ভট্টাচার্যর ‘ডিপ্লোম্যাট’, শৌনক গুপ্তর ‘ফিদেল কাস্ত্রো’, সৌরীন সেনের ‘কান্না ঘাম রক্ত’, বেদুইনের ‘সিয়া একটি গোপন চক্র’, চাণক্য সেনের ‘সে নহি সে নহি’, ‘মুখ্যমন্ত্রী’, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘নিশীথ ফেরী’, সমরেশ বসুর ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’, ‘অরণ্যের অধিকার’, মনোজ বসুর ‘ভুলি নাই’, ‘আগস্ট বিপ্লব’ ইত্যাদি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

‘হাজার চুরাশির মা’-তে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী কারাগারে বন্দী। তার মায়ের একাকীত্ব স্বামীর স্বার্থপরতা পুত্রের প্রতি অপার বাৎসল্য তাকে জেলখানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। তিনি জেলে বন্দী পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন তার পুত্রের জেলখানার বন্দী নম্বর উল্লেখ করে তাকে ‘হাজার চুরাশির মা’ বলা হয়। মুহূর্তে মণিদীপা মনে করেন তিনি শুধু এক সন্তানের জননী নন, যার পুত্র জেলে বন্দী! বরং যেসব মায়ের সন্তানেরা জেলে আছে তিনি তাদেরও মা। তিনি বন্দীদশা প্রাপ্ত সব সন্তানের মা। এখানেই এই উপন্যাসটির মহত্ব।[১৭]

বাস্তববাদী রাজনৈতিক উপন্যাস ‘অরণ্যের অধিকার’।বীরসা মুন্ডার জীবন ও বিদ্রোহ, পরিশেষে ট্র্যাজিক পরিণতি সমকালীন রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়। জীবন ও রাজনীতির সততায় বিশ্বাসহীনতা সাম্প্রতিক উপন্যাস জগতের পরিচয় মাত্র, সমগ্র পরিচয় নয়। বর্তমানের

বহুমুখ জটিল বাস্তবের একদিকে অর্থহীন অস্থিরতা প্রকাশ পেলেও আরেকদিকে কোন ধ্রুবশক্তির কল্পনায় আস্থা স্থাপনের নির্দেশও দুর্লভ নয়। মানুষের সহজাত মানবিকতা ও শুভবুদ্ধি দুর্জয়শক্তি নিয়ে সমস্ত বিরুদ্ধ বিরুদ্ধাচার ও অন্যায় শক্তিগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি', 'পাতক', 'বিবর', 'মানুষই শক্তির উৎস', রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'জীবন যেরকম', 'জন অরণ্য' এই শ্রেণীর উপন্যাস।[১৮] ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের আবর্তের মাঝখানে উঠে আসতে পারে অর্জুনের মত চরিত্র। জীবনের সব সর্পিলতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে উদঘাটন করার প্রেরণাতেই এই কাহিনী রচনা করেন তিনি। 'একা এবং কয়েকজন', 'সেই সময়', 'অর্ধেক জীবন'- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আত্মজৈবনিক কাহিনীর আঙ্গিকে রচনা করলেও দেশকাল রাজনীতি সমাজনীতি সমস্ত বিষয়েই জীবনের বর্ণনায় কোন আবরণ রাখেননি। তাই একে মহা-উপন্যাসও বলা যায়।[১৯]

এইভাবে ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে তরুণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও জীবনকে বৃহত্তর ও পটভূমিতে পূর্ণতর রূপে দেখার চেষ্টা। অর্থশালী, নিম্নবিত্ত, দরিদ্র দুঃখী —সবাই এদের উপন্যাসের কুশীলব। তাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' শুধু প্রেমবিধুর জ্যাঠামশাইয়ের ট্রাজিক কাহিনী নয়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বকালের পূর্ব বাংলার একটি পরিবার ও সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে একটা বৃহৎ গ্রামাঞ্চলের আবর্ত সঙ্কুল কাহিনী।বহুসংখ্যক চরিত্র, তেমনই বিচিত্রমুখী তাদের স্বভাব। গ্রামের প্রকৃতি ও পশু পাখি, শস্যক্ষেত্র শালুক ফুল ভরা দিঘী- যেখানে প্রতিবছরই একজন না একজন মানুষের মৃত্যু অনিবার্য — এ সমস্তই এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটি গ্রাম্য প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্কে গড়ে ওঠা জীবনের নতুন পথের পাঁচালী। আমাদের গতানুগতিক জীবনও যে প্রকৃতিপক্ষে গভীর রহস্যের সূত্রে একাত্ম, ঔপন্যাসিক এই সত্যটি উদঘাটন করে দেখিয়েছেন উক্ত উপন্যাসে। 'অলৌকিক জলযান' উপন্যাসে সামুদ্রিক জীবনের বিস্তৃত রহস্যের চিত্র এঁকেছেন অন্যপক্ষে এই রূপই কোন জীবনজিজ্ঞাসার বিচিত্র পথে ভ্রমণ করেছে সমরেশ বসুর 'কোথায় পাব তারে'-তে। বর্তমানে উপন্যাসে বেশ লক্ষণীয়ভাবে দেখা দিয়েছে সাংবাদিক ধর্ম। কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি ও সমকালীন জীবনের বাস্তবের সীমারেখাকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে এসব উপন্যাস। বরুণ সেনগুপ্তর 'সব চরিত্র কাল্পনিক', গৌরকিশোর ঘোষের 'গড়িয়াহাটা ব্রিজের উপর থেকে দুজনে', শঙ্করের 'বোধোদয়', 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি', 'স্থানীয় সংবাদ' প্রভৃতি রচনায় আমাদের কাছে তুলে ধরেন বিশেষ কাল খন্ডের সীমায় জীবনের দিনলিপি। শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' পাক-সৈন্য আক্রান্ত বাংলার একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির প্রতিলিপি যা তৎকালীন রাজনৈতিক চর্চার একটি বিষয়। আবার আঞ্চলিক জীবনযাত্রায় পটভূমিকার ফটোগ্রাফিও হয়ে উঠেছে কারও কারও রচনা। আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর', 'মাটির কাছাকাছি' কিংবা 'মাতালের হাট' অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখন্ড' তার বলিষ্ঠ উদাহরণ।

অপরপক্ষে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চকে ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ করে এদেশীয় রাজনৈতিক জীবনধারার মধ্যে থেকে ইতিহাসের অমোঘ গতিটি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। সত্তর দশকের শুরু থেকেই যে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়েছে তার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অসীম রায়ের 'দেশদ্রোহী' পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ উপন্যাস। 'শব্দের খাঁচায়' গ্রন্থ লেখক দেখিয়েছেন রাজনৈতিক বুলি-সর্বস্বতায় জীবন কিভাবে অন্তঃসারশূন্য মিথ্যাচারে পরিণত হয়। রাজনৈতিক খেলার উত্থান-পতন কেমন ইতিহাসেরই অমোঘ গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। অসংখ্য শিক্ষিত যুবক এই মূঢ় রাজনীতির ভেলায় অবতরণ করে শেষ পর্যন্ত জীবন ও পরিবার থেকে হারিয়ে যায়। তাদের আদর্শ ও আত্মত্যাগ কতিপয় সুবিধাভোগীর শ্রেণীর রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনের যে সহায়ক হয় তার করুন ও মর্মস্পর্শী কাহিনী দেবেশ দাশের 'আপাতত শান্তি বজায় আছে' অথবা তপোবিজয় ঘোষের 'রাতের ফেরি'তে চিত্রিত। রাজনৈতিক কর্মীদের জেল জীবনে যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে থাকে তারই মধ্যে অনশন ধর্মঘটের মত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের একটি স্বাভাবিক সম্পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হাংরাস' উপন্যাসে। বাস্তব তথ্যভিত্তিক বর্তমান রাজনীতি বিষয়ক উপন্যাসের এটি একটি সুন্দর ও সার্থক উদাহরণ।

দেশ-কাল রাজনীতির আরও উপন্যাসগুলি হল সমরেশ মজুমদারের 'কালপুরুষ' ও 'সাতকাহন'।[২০] রাজনৈতিক জীবনের পটভূমিকায় অনিমেষ ও মাধুরীলতা যেন বাস্তব জীবন-সচেতন ও মূল্যবোধের প্রতিনিধি। 'সাতকাহন'-এ দীপাবলি ওরফে দীপা এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী ও উজ্জ্বল বাস্তববাদী মনের নারী। নারী স্বাধীনতার নামে যে স্ববিরোধী ক্রিয়াকলাপ প্রায়শই দেখা যায় দীপা তার ব্যতিক্রম। এই উপন্যাসেরই প্রতিফলন দেখা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চতপা' ও 'শতাব্দীর মৃত্যু' উপন্যাসে।

বর্তমান দশক জীবন ভাবনার দিক থেকে প্রধানত অবিশ্বাস ,ক্ষোভ ,ক্রোধ ও বিপ্লবের শতক। অবশ্য এই বিপ্লবের অভ্যন্তরে নতুন রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাস আছে। তাই নতুন যুগের লেখক তিলোত্তমা মজুমদারের 'শামুকখোল', সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুহ্', স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর 'অসম্পূর্ণ' বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্ত্র', সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাঁচের দেওয়াল'-এর মতো সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাসে দেহমন আদর্শ সব মিলিয়ে সমগ্র অস্তিত্বের অন্তর-বাহির বিদীর্ণকারী সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। আর সেই উত্তরণের নবপর্যায়ে আত্মশক্তি ও আত্মচেতনার বিকাশের উজ্জ্বল পরিচয় প্রদান করেছেন তাঁরা। কত বিচিত্র বাধা-বিপত্তি, দারিদ্র্য ও সংঘাতের ভেতর দিয়েই বয়ে চলেছে মানুষের জীবনের ধারা এক সাগর সঙ্গমের দিকে। সেই মোহনার ঠিকানা এখনও আমাদের অজানা, তবু মানুষের সমাজকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেই সব বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে। তাই রবীন্দ্র পরবর্তী উপন্যাসে রাজনীতি ও সমাজ চেতনার বিভিন্ন ধারা একটি মহানদীর মতোই অগ্রসর হয়েছে বলে মনে হয়।

গ্রন্থসূত্র-

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, পৃষ্ঠা ৪৮
২) সেন, সুকুমার, পৃষ্ঠা ২৫
৩) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র,পৃষ্ঠা ৬৫
৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, পৃষ্ঠা ৫৫
৫) বসু, অমলেন্দু, পৃষ্ঠা ২১৪
৬) মিত্র, প্রেমেন্দ্র, পৃষ্ঠা ৫৩
৭) মিত্র, প্রেমেন্দ্র, পৃষ্ঠা ৭২
৮) হালদার, গোপাল, পৃষ্ঠা ৫৫
৯) শ, রামেশ্বর, পৃষ্ঠা ৫০-৭২
১০) চক্রবর্তী, সুমিতা, পৃষ্ঠা ৪৮
১১) বন্দোপাধ্যায়, মানিক, পৃষ্ঠা ২৬-৪৪
১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৮
১৩) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, পৃষ্ঠা ১০০
১৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, পৃষ্ঠা ২৬
১৫) ভাদুড়ী, সতীনাথ, পৃষ্ঠা ২৪
১৬) ঘোষ, প্রসূন, পৃষ্ঠা ৮২
১৭) দেবী, মহাশ্বেতা, পৃষ্ঠা ৭১-৮০
১৮) রায়চৌধুরী, ঝুমা, পৃষ্ঠা ১২৭-১৪১
১৯) গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, পৃষ্ঠা সমগ্র
২০) মজুমদার, সমরেশ, পৃষ্ঠা ৩৪

গ্রন্থঋণ-

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা।* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬৭।
সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।* ২য় খন্ড, ইস্টার্ন পাবলিশার্স , কলকাতা, ১৩৭০।
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। *পথের দাবী।* বঙ্গবাণী পত্রিকা কলকাতা, ১৩৩৩।
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।* ওরিয়েন্ট বুক, কলকাতা, ১৯৪৮।
বসু, অমলেন্দু। *বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে।* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৮।
মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *পাঁক।* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৩।
মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *মহানগর।* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৭।

হালদার, গোপাল। *একদা।* এ মুখার্জি এন্ড কোং , কলকাতা, ১৯৩৯।
শ, রামেশ্বর। *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রবন্ধ।* পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০২২।
চক্রবর্তী, সুমিতা। *উপন্যাসের বর্ণমালা।* পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০২২।
বন্দোপাধ্যায়, মানিক। *শহরতলী।* শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৩৯।
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।* প্রথম প্রকাশ শারদীয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৪৬।
মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। *মানদণ্ড।* প্রথম প্রকাশ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৮।
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *অশনিসংকেত।* বিভূতি রচনাবলী, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ১৯৪৩।
ভাদুড়ী, সতীনাথ। *জাগরী।* কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ১৯৫৫।
ঘোষ, প্রসূন। *বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন।* আশাদীপা প্রকাশন, কলকাতা, ২০২২।
দেবী, মহাশ্বেতা। *হাজার চুরাশীর মা।* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪।
রায়চৌধুরী, ঝুমা। *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু।* সামগ্রিক মূল্যায়ন, অঞ্জুলী প্রকাশনী, কলকাতা।
গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। অর্ধেক জীবন। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।
মজুমদার, সমরেশ। সাতকাহন। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৯৯৮।